দরসে তাযকিয়াহ

(২য় পর্ব)

গীবত এবং চোগলখুরি

মাওলানা আসেম উমর হাফিজাহুল্লাহ্

আমীর
আল কায়দা ভারতীয় উপমহাদেশ

النصر
AN-NASR

দরসে তাযকিয়াহ

(২য় পর্ব)

গীবত এবং চোগলখুরি

মাওলানা আসেম উমর হাফিজাহুল্লাহ

আস সাহাব মিডিয়া

শাবান ১৪৩৮ হিজরি

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدالمرسلين ،وعلى آله وصحبه أجمعين ، اما بعد

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم **قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا**

و قال سبحانه و تعالي: **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا**

আমার প্রিয় মুজাহিদ ভাই-বোনেরা!

এই দরসসমূহ সেই প্রচেষ্টার-ই ধারাবাহিক অংশ, যার জন্য আমরা স্বীয় জানের সওদা করেছি। যে উদ্দেশ্যে আপনারা হিজরত ও জিহাদের ময়দানে কদম রেখেছেন। যার জন্য আপনারা সারা দুনিয়ার বাতিল পরাশক্তির সাথে শত্রুতা পোষণ করেন।

এটা হচ্ছে উদ্দেশ্য যে দুনিয়া থেকে কুফরি নেযাম ও অনৈসলামিক জীবনপদ্ধতি খতম করে মহার আল্লাহর নাযিলকৃত নেযাম এবং মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আনিত জীবনপদ্ধতি দুনিয়াতে প্রসার ও প্রচলন করা।

যে কিতাল ফি সাবিলিল্লাহর ঝান্ডা আমরা উত্তোলন করেছি এবং এর জন্য সকল কষ্ট-ক্লেশ আমরা বর্দাশত করেছি, তার শেষ ও প্রান্তসীমা কি?

وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ অর্থাৎ **পরিপূর্ণ দ্বীন**, সমগ্র জীবনপদ্ধতি **যেন আল্লাহর জন্য হয়ে যায়,** আল্লাহর শরিয়ত অনুযায়ী হয়ে যায়।

ইহার জন্য যেখানে এক দিকে নিজের প্রকাশ্য শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছি, অপর দিকে নিজের অপ্রকাশ্য শত্রু অর্থাৎ নফসের মোকাবেলা করাও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

মুজাহিদের জিহাদ বিশুদ্ধকারী ও বিনষ্টকারী এই অপ্রকাশ্য শত্রু মারাত্মক ক্ষতিকারক। সুতরাং যেভাবে আমরা নিজের প্রকাশ্য শত্রুর সামরিক ষড়যন্ত্র ও তার অপকৌশল ও ধোকাবাজি থেকে বেচে থাকি, তাদের পাতানো গোয়েন্দা জাল সম্পর্কে চৌকান্না থাকি, এমনিভাবে আমাদের অপ্রকাশ্য দুশমনের ধোকাবাজি থেকেও সর্বদা সচেতন থাকা অতিব জরুরি।

গাফলতির সময়ই আক্রমণ করা সর্বোত্তম সময়। যে নিজের নফসের অনিষ্টতা থেকে, নিজের নফসের চালাকি ও অপকৌশল থেকে গাফেল হয়ে গেল, সে তার ধোকাবাজি ও আক্রমণের শিকার হতে পারে।

সুতরাং গত মজলিসে আমরা নফসের ওই আক্রমণ সম্পর্কে আলোচনা করেছি, যা অন্তরের উপর হয়ে থাকে এবং অন্তরের মধ্যেই জায়গা করে নেয়। অন্তরে জায়গা করে নেওয়ার পর এর প্রতিক্রিয়া মানুষের বাহ্যিক অবস্থার উপর প্রভাব ফেলে, যার প্রথম মাধ্যম হলো জিহ্বা।

জবান দ্বারা মানুষের ভিতরে যা থাকে, তা –ই প্রকাশ পায়। সুতরাং আজ আমরা জবানের হেফাজত ও এর প্রভাব সম্পর্কে আলোচনা করবো। আল্লাহর নিকট দুয়াপ্রার্থী যে তিনি আমাদের জবানকে তার সন্তুষ্টির অনুগামী বানিয়ে দিন। আল্লাহ তায়ালা এই জবান দ্বারা কল্যান অর্জনকারী বানিয়ে দিন এবং তার অসন্তুষ্টিমূলক কথাবার্তা থেকে আমাদের হেফাজত করুন।

আল্লাহ তায়ালা বলেন-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

“হে ঈমানদারগণ! আল্লাহকে ভয় কর এবং সুদৃঢ় কথা বলো।”

অর্থাৎ নাজায়েয, মিথ্যা এবং এমন কথাবার্তা, যা থেকে আল্লাহ ও তাঁর রাসুল নিষেধ করেছেন তা নিজের জবান দ্বারা বের করো না!

আরেকটু সামনে বেড়ে আল্লাহ তায়ালা বলেন-

يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ

ইমাম ইবনে কাসির রহ. এর তাফসীরে বলেন-

ووعدهم أنهم إذا فعلوا ذلك ، أثابهم عليه بأن يصلح لهم أعمالهم

"আল্লাহ তায়ালা এই জবানের হেফাজতের মাধ্যমে অর্থাৎ তুমি জবান দ্বারা জায়েয এবং সত্য কথা বলবে তো আল্লাহ তায়ালা প্রতিদানস্বরুপ তোমার গুনাহ মাফ করে দিবেন।"

লক্ষ্য করুন, জবানের হেফাজত করার প্রভাব কী পরিমান দূরত্বে গিয়ে পড়ছে যে আল্লাহ তায়ালা এর বদলায় বলেন **يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ "আল্লাহ তায়ালা তোমাদের আমল সংশোধন মাফ করে দিবেন।"**

সুতরাং এই বিষয়ের গুরুত্ব সম্পর্কে রহমাতুল্লিল আলামিন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও সীমাহীন গুরুত্বপূর্ণ বাক্য বর্ণনা করেছেন।

তিনি বলেন

من كان يؤمن بالله واليوم الآخر

যে ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালাকে এক রব মানে, এবং এমনভাবে মেনে নেয় যে, আগামীকাল তার সামনে জবাবদিহিতার জন্য দাড়াতে হবে।

একটু চিন্তা করুন যে ব্যক্তির বাদশাহর রাজকীয় আদালতে গিয়ে দাড়ানোর ইয়াকিন হয়ে যায় তার উচিৎ

فليقل خيرا أو ليصمت

যার এই বিশ্বাস আছে যে নিজের রবের সামনে দাড়াবে এবং একটি একটি করে আমলগুলো দেখানো হবে তার উচিত সে জবান দ্বারা উত্তম বাক্য বলবে, কল্যাণের কথা বের করবে অথবা চুপ থাকবে।

সুতরাং যদি আমাদের জবানের হেফাজত করতেই হয়। আমাদের এই কথার গুরুত্ব দিতেই হয় যে, আমাদের জবান দ্বারা কল্যাণ বের হবে অথবা আমরা চুপ থাকব তবে মানুষ অগনিত গুনাহ থেকে বাচতে পারে, অনেক ফেতনা ফাসাদ থেকে এবং খারাবি আল্লাহর অসন্তুষ্টিমুলক কথাবার্তা থেকে বাচতে পারে।

জবানের বিপদ- যার সম্বন্ধে সালাফগণ অনেক কিছু লিখেছেন- রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন- যে আমাকে দুটি বস্তুর জামানত দিতে পারবে, আমি তাঁর জান্নাতের দায়িত্ব দিবো।

ما بين الفخذين وما بين الشفتين

যা দুই রানের মধ্যবর্তী স্থানে রয়েছে অর্থাৎ লজ্জাস্থানের হেফাজত এবং জবানের হেফাজত।

এই জবান দ্বারা মানুষ রবকে কতইনা অসন্তুষ্ট করতে পারে এবং কী পরিমান গুনাহ-ই না অর্জন করতে পারে! এগুলোর মধ্যে একটি বড় গুনাহ হলো চোগলখোরি ও গীবত।

গীবতের মন্দচর্যের জন্য কুরআনের আয়াতের এই অংশই যথেষ্ট

وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا ۚ

"তোমরা কেউ আপরের গীবত করবে না!"

أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ ۚ

"তোমাদের কেউ কি এটা পছন্দ করবে যে, সে নিজ ভাইয়ের গোশত খাবে?"

লক্ষ করুন কুরআনে কারীম কীভাবে এর খারাবি বয়ান করছে এবং নবুওয়াতী জবান দ্বারা এর ভয়ানক পরিণতির ঘোষনা করছে। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন যে, মেরাজে আমি এমন লোকদের পাশ দিয়ে অতিক্রম করি

يخمشون وجوههم بأظافرهم

"যারা নিজের নখ দ্বারা নিজের চেহারা ক্ষত বিক্ষত করছে।"

জিবরাঈল আ. বলেন-

هؤلاء الذين يغتاب الناس ويقعون في أعراضهم

"এরা হলো যারা অপরের গীবত করতে এবং তাদের ইজ্জত ধূলিসাৎ করত।"

এমনিভাবে চোগলখোরী। এটা সমাজে বা জীবনে ভয়াবহ প্রভাব পরে যেমন, তেমনভাবে চোগলখোরি ও সমাজের জন্য বা জীবনের জন্য প্রভাব বিস্তারকারী কাজ করে যে, সবচে একতাবদ্ধ সমাজকে ছিন্নবিচ্ছিন্ন করে দিয়েছে।

সুতরাং নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর খারাবি বর্ণনা করেছেন-

تجد من شرار الناس عند الله يوم القيامةالذي يأتي هؤلاء بحديث هؤلاء وهؤلاء بحديث هؤلاء

অর্থাৎ "এখানকার কথা ওখানে লাগানো, ওখানের কথা এখানে লাগানো, আল্লাহর কাছে কিয়ামতের দিন সবচে' গজবপ্রাপ্ত লোকদের অন্তর্ভুক্ত হবে এরা।"

সুতরাং এখানকার কথা ওখানে লাগানো, ওখানের কথা এখানে লাগানো, এগুলোর দ্বারা ফাসাদ ছাড়া আর কিছুই হয় না। সমাজ ছিন্নবিচ্ছিন হয়ে যায়। অন্তরসমূহের মাঝে ভাঙ্গন সৃষ্টি হয়। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন- তারা কিয়ামতের দিন আল্লাহর সবচে' অপসন্দনীয় লোকদের মধ্য থেকে হবে

المشاؤون بالنميمة المفرقون بين الأحبة

"চোগলখোর এবং বন্ধুদের মাঝে বিভেদ সৃষ্টিকারী।"

ওই আট শ্রেণীর লোক, যারা কিয়ামতের দিন সবচে' গজবপ্রাপ্ত হবে, যারা আল্লাহ তাআলার কাছে সবচে' অপসন্দনীয় হবে, তাদের মধ্যে এদেরকেও বর্ণনা করা হয়েছে।

المشاؤون بالنميمة المفرقون بين الأحبة

"চোগলখোর এবং বন্ধুদের মাঝে বিভেদ সৃষ্টিকারী।"

এখন প্রশ্ন হল এই যে, চোগলখুরি কত বড় গুনাহ মুসলমানরা জানে এবং যে কোন সম্পর্ক ধ্বংসের জন্য এতোটুকুই যথেষ্ট তা জানা সত্ত্বেও, -সমাজের মাঝে পুরাটাই ভালো হোক, কিন্তু এই রোগ যদি বিদ্যমান থাকে, তাহলে সম্পর্ক টিকতে পারে না। সেই সম্পর্ক ভেঙ্গে যাবে, মুহাব্বাত খতম হয়ে যাবে। ওই অন্তরসমূহের মাঝে ঘৃণা

থেকে যাবে।- তারপরও আমাদের সমাজসমূহ এই রোগে আক্রান্ত কেন? আমাদের মাঝে কেন এই বিষয়টি বিদ্যমান আছে? কেন আমরা বের করে ফেলতে পারছি না?

একজন মুসলমান এটা থেকে তাওবাও করে নেয়, কিন্তু কিছু সময় পর পুনরায় এতে লিপ্ত হয়ে পরে। যদি কখনো সরাসরি লিপ্ত নাও, কিন্তু অপব্যাখ্যা করে এর ফাঁদে ফেঁসে যায় এবং নফস তাকে পুনরায় এই এর মাঝে লিপ্ত করে ফেলে।

তাবীল বা অপব্যাখ্যা করে যে, আমরা তো এই কথা তার মুখের সামনেই বলেছি, সুতরাং সমস্যা হওয়ার কথা না!

যাই হোক আপনি যদি তার সামনেই বলে থাকেন, তবুও এটা গীবত-ই হবে, চোগলখুরি-ই হবে। সুতরাং এই অপব্যাখ্যা করে এটাকে নিজের জন্য জায়েজ করে নেওয়া ঠিক নয়।

এখন প্রশ্ন থেকে যায় যে, এটাকে কিভাবে প্রতিরোধ করা যায়? কিভাবে আমরা আমাদের ইসলাহ করবো, যে রোগ টি মহামারীর রুপ ধারণ করেছে।

আমরা যদি মহামারীকে প্রতিরোধ করতে চাই, তাহলে প্রথমে আমাদেরকে সমাজ সংশোধনের সেই পদ্ধতির দিকে দেখতে হবে, যার তরবিয়ত মানবতার ইমাম আকায়ে মাদানি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বয়ং করেছেন।

আসুন! রহমাতুল্লিল আলামিন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র জীবনের উপর গভীরভাবে চিন্তা ফিকির করি।

আরবের জাহেলি সমাজকে রহমাতুল্লিল আলামিন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিভাবে একটি উপমাপ্রদানযোগ্য সমাজ বানালেন! রহমাতুল্লিল আলামিন সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনপদ্ধতি ও নবুওয়াতের সেই যুগ নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা ফিকির করলে একটি বিষয় বুঝে আসে, চোগলখুরি ও গীবত থেকে বাঁচানোর জন্য রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শুধু একাকী উৎসাহ প্রদান করেই ক্ষান্ত হন নি, অর্থাৎ শুধুমাত্র সেই হাদিসগুলো বর্ণনা করেই ক্ষান্ত হন নি, যেগুলোতে চোগলখুরি ও গীবত করার ব্যাপারে কঠিন ধমকিসমূহ শোনানো হয়েছে বরং এই মহামারী প্রতিরোধ করার জন্য রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পুরো সমাজকে আন্দোলিত করেছেন। অর্থাৎ মুসলমানদের শুধু গীবত পরিত্যাগের উৎসাহ-ই দেন নি, বরং অন্য মুসলমানকে গীবতকারীকে প্রতিহত করা, তার মজলিস থেকে উঠে যাওয়া, এবং যার গীবত করা হচ্ছে, তার পক্ষ থেকে প্রতিরোধ করণের মাধ্যমে এই মহামারীর গোঁড়া উপড়ে দিয়েছেন।

কেন? কারণ হল গীবত ও চোগলখুরি হচ্ছে একটি ছোঁয়াচে রোগ, এই গুনাহের প্রভাব শুধু কর্তা ব্যক্তির সাথেই খাস নয়, বরং উক্ত মজলিস এবং পুরো সমাজে তা ছড়িয়ে পড়ে। সুতরাং এই মহামারীকে প্রতিরোধ করার জন্য হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পুরো সমাজকে সামগ্রিকভাবে উৎসাহ প্রদান করেছেন। এবং এটাকে সহ্য করা এবং চুপ থাকার ব্যাপারে অত্যান্ত অসন্তুষ্টি প্রকাশ করেছেন।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সমাজে সংক্রামক এই ব্যাধিকে অত্যান্ত অপসন্দ করেছেন যে, এক মুসলমান এই ব্যাধি হতে দেখেও চুপ থেকে তামাশা করবে, বান্দার অসন্তুষ্টি থেকে বাঁচার জন্য আল্লাহ তাআলাকে অসন্তুষ্ট করে বসবে!

সুতরাং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর আনুগত্যকারীদের মন্দ ও অসামাজিক কর্মকাণ্ডকে প্রতিরোধ করার জন্য সাহসী ও বাহাদুর বানিয়েছেন। তাঁদেরকে উদ্বুদ্ধ করেছেন। বিভিন্ন আঙ্গিকে তাঁদেরকে উৎসাহিত করেছেন।

সমাজকে কিভাবে আন্দোলিত করা হয়েছে? চোগলখুরি ও গীবতকে প্রতিহত করার জন্য সমাজকে কিভাবে কার্যকর করা হয়েছে? তার মধ্য একটি হল নিজ মুসলমান ভাইয়ের অনুপস্থিতিতে তাঁর প্রতিরক্ষা করবে। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চোগলখুরি ও গীবত প্রতিরোধের জন্য এমনটি করেছেন। সাহাবায়ে কেরামকে উদ্বুদ্ধ করেছেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন-

من رد عن عرض اخيه كان حقا علي الله ان يرد عن عرضه يوم القيامة

"যে কেউ তাঁর মুসলমান ভাইয়ের ইজ্জতের প্রতিরক্ষা করলো, আল্লাহ তাআলার জন্য আবশ্যক যে, আল্লাহ তাআলা কিয়ামতের দিন তাঁর ইজ্জতের হেফাজত করবেন।"

অন্য বর্ণনায় এসেছে, আল্লাহ তাআলা এই ব্যক্তিকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দান করবেন।

লক্ষ্য করুন! চোগলখুরি ও গীবতকে প্রতিরোধ করার জন্য সমাজকে আন্দোলিত করা হচ্ছে!

যখন একজন মুসলমান অপর মুসলমান ভাইয়ের অনুপুস্থিতিতে তাঁর দোষ সহ্য করবে না, তাঁর প্রতিরক্ষাকারী হয়ে যাবে, অতপর কার সাহস হবে যে, সে কারো দোষ বর্ণনা করবে। অতঃপর যখন এটা সমাজের একটি ব্যাপক পরিবেশ হয়ে যাবে, তখন যদি কারো গীবত করতে অন্তরে চায়ও, কিন্ত সে বুঝবে যে, পরিবেশ গীবতের উপযুক্ত নয়। সুতরাং সে এই মন্দ কাজ থেকে বিরত হয়ে যাবে।

অন্য বর্ণনায় রহমাতুল্লিল আলামিন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সমাজকে এই গুনাহের বিরুদ্ধে আন্দোলিত করার জন্য পরিষ্কার ভাষায় নির্দেশ দিয়েছেন-

إِذَا وُقِعَ فِي رَجُلٍ وَأَنْتَ فِي مَلأٍ

"যখন কোন মজলিসে কোন মুসলমানের গীবত করা হয়, আর তুমি এই মজলিসে উপস্থিত আছ,"

فَكُنْ لِلرَّجُلِ نَاصِرًا

"তাহলে যার দোষ বর্ণনা করা হচ্ছে, তাঁর সাহায্যকারী হয়ে যাও!" অর্থাৎ তাঁর বৈধ প্রতিরক্ষা কর!

وَلِلْقَوْمِ زَاجِرًا

"এবং এই মজলিসের লোকদেরকে এই মন্দ কাজের ব্যাপারে সতর্ক কর!" যে তোমরা উপস্থিত থাকা অবস্থায় এই ব্যক্তি কোন মুসলমানের দোষ বর্ণনা করছে, আর তোমরা চুপ করে আছ! সমাজকে আন্দোলিত করার এবং কোন জামাআতের সদস্যদের আন্দোলিত করার এটা একটি উত্তম মাধ্যম।

দেখুন যদি একাকী নসিহত করা হয়, তাহলে মানুষ কমজোর, আয়াত শোনা সত্ত্বেও, হাদিসসমূহ শোনা সত্ত্বেও, ধমকিসমূহ শোনা সত্ত্বেও কিন্তু গাফলতি তার উপর ছেয়ে যায়।

মোটকথা মানুষের উপর গাফলতি ছেয়ে যায়, এ কারণেই তো তার দ্বারা গুনাহ হয়ে যায়। কিন্তু যখন আশেপাশের পরিবেশ সতর্ককারী হিসেবে বিদ্যমান থাকে, অর্থাৎ যদি কখনো তার উপর গাফলতি চেপে বসে, তখন আশাপাশের পরিবেশ তা দূর করে দেয়, তাহলে যে কোন পরিস্থিতিতেই এই মুসলমান এই গুনাহ থেকে বিরত হয়ে যাবে। এই গীবত করা থেকে বিরত হয়ে যাবে।

এই জন্য শরিয়ত পরিবেশকে সংশোধনের জন্য অনেক জোর দেয়। যদি প্রতিরক্ষা করতে না পারে, অর্থাৎ না আপনারা বিরোধিতা করতে পারেন, আর না মন্দ কর্মকাণ্ডকারী, চোগলখোর অথবা গীবতকারীকে আপনারা প্রতিহত করতে না পারেন, তাহলে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহিয়া ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন-

أَوْ قُمْ عَنْهُمْ

"এই মজলিস থেকে উঠে যাও!" এর ফলেও গীবতকারীর উৎসাহ ভেঙ্গে যাবে।

আল্লামা ইবনে হাজার রহ. ফাতহুল বারীতে ইমাম গাজালি রহ. এর হাওয়ালা দিয়ে চোগলখুরির প্রতিরোধ করার ব্যাপারে খুবই চমৎকার একটি কথা নকল করেছেন- আল্লাহ তাআলা এর মাধ্যমে আমাদের উপকারী বানান।

যখন কারো সামনে কারো চোগলখুরি করা হবে, তার উচিত সে যেন এই কথায় বিশ্বাস না করে। যে চোগলখুরি করছে, তার কথা বিশ্বাস না করা হোক। এই ব্যাপারে কোন ধারণা ই না করুক, জেহেনেও না আনুক, অন্যথায় সে হতভম্ব হয়ে যাবে যে, সত্য কোনটা মিথ্যা কোনটা?

তবে তা যদি কোন ইজতিমায়ি বিষয় হয়, যার ব্যাপারে শরীয়ত অনুমতি প্রদান করে। তবুও এই চোগলখোরকে প্রতিহত করা হবে। তার সম্মুখে এই চোগলখুরির খারাবি বর্ণনা করবেন, আর যদি এই ব্যক্তি এই স্বভাব থেকে ফিরে না আসে, তাহলে তাকে মন্দ লোক ধারণা করবেন।

আর হ্যা এরপর এটাও খেয়াল রাখতে হবে যে, এমন যেন না হয় যে, আপনিও বর্ণনা করা শুরু করলেন, তাহলে তো আপনিও চোগলখোর হয়ে যাবেন।

إِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُم

এমন যেন না হয় যে, আপনিও আপনার মুখে সেই কথাগুলো বর্ণনাকারী না হয়ে যান।! বরং যদি কোন মুসলমানের ব্যাপারে কোন কথা শুনেন,

وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُم مَّا يَكُونُ لَنَا أَن نَّتَكَلَّمَ بِهَٰذَا

যখন কোন মুসলমানের ব্যাপারে আপনি কোন কথা শুনেন, তাহলে বলুন মায়াজাল্লাহ **আমরা এই কথা বলি না।**

ভালো কথা বলা উচিত এবং ধারণা করা উচিত নয়। এই যে দৃষ্টিভঙ্গি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সমাজে সৃষ্টি করেছেন, তা গীবত এবং চোগলখুরির জন্য প্রতিবন্ধক হয়ে গেল। দেওয়াল হয়ে দাঁড়াল। এর ফায়েদা এটা হবে যে, আমরাও যদি এর মেহনত করি, যে, যখন সমাজই এর বিরুদ্ধে চলে যাবে, তখন আর কোন ব্যক্তির গীবত ও চোগলখুরির সুযোগ হবে না।

আপনারা কি লক্ষ্য করেন নি যে, যে কাজগুলোর ব্যাপারে সমাজে মন্দ ধারণা প্রচলিত আছে, সেগুলো কখনো সমাজে ব্যাপক হয় না।

এখানে একটা কথা জেহেনে রাখা জরুরি, আমর বিল মারুফ ওয়া নাহি আনিল মুনকারের সর্বনিম্ন স্তর এটা বর্ণনা করা হয় যে, যদি কোন মন্দ কাজকে হাত দ্বারা প্রতিহত করা না যায়, তাহলে মুখ দ্বারা প্রতিহত করা হবে, আর যদি মুখে প্রতিহত করার সাহস না হয়, তাহলে অন্তরে ঘৃণা করা হবে, এটা ঈমানের সর্বনিম্ন স্তর বয়ান করা হয়।

যদি কোন সমাজের মাঝে এই সর্বনিম্ন স্তরই মাপকাঠি হয়ে যায় যে তারা হাত দ্বারা না কোন মন্দ কাজ প্রতিহত করে, আর না মুখ দ্বারা কোন মন্দ কাজ প্রতিহত করে, এবং বলে থাকে যে, এটাও তো ঈমানের স্তর এবং অন্তরে খারাপ জানাটার উপরই

ক্ষান্ত করে নেয়, তাহলে এর উদ্দেশ্য হল এই যে, এই সমাজ অথবা জামাআত ঈমানের এই স্তরে এসে দাঁড়িয়েছে।

কেননা তারা নিজেরাই নিজেদেরকে ঈমানকে এই স্তরে এনে নামিয়েছে। ফলে তারা না কোন মন্দ কাজকে হাত দ্বারা প্রতিহত করে, আর না মুখ দ্বারা প্রতিহত করে যে, বান্দার ভয় আল্লাহর ভয়ের উপর বিজয়ী হয়ে গিয়েছে। তো নিজেরাই ঈমানের সর্বনিম্ন স্তরে এসে দাঁড়িয়েছে। হাত বা মুখ দ্বারা যখন এই মন্দকাজগুলোকে প্রতিরোধ না করবে, তখন তো এদের পথ থেকে প্রতিবন্ধকতা শেষ হয়ে যাবে। এবং আপনারা জানেন মন্দকাজগুলোকে প্রতিহত করার ক্ষেত্রে সামাজিক প্রতিরোধ কত বড় ভূমিকা রাখে, এর আন্দাজ শরীয়তে এর গুরুত্ব অনুধাবন করার দ্বারা করতে পারেন। আপনারা এর গুরুত্ব কিতালের ফাজায়েল, এর হুকুম আহকাম, এবং আমর বিল মারুফ ওয়া নাহি আনিল মুনকার এর গুরুত্ব দ্বারা অনুধাবন করতে পারবেন।

সুতরাং যখন কোন সমাজে মন্দ কাজ ব্যাপক হয়ে যায়, এবং কোন আত্মসম্মান বোধসম্পন্ন মুসলমান হাত দ্বারা তা প্রতিহত করার সাহসকারীও অবশিষ্ট না থাকে, তাহলে এমন পরিবেশে কোন নেককার থেকে নেককার মুসলমানও কত দিন তা মন্দ বলে ঘৃণা করতে পারে? অর্থাৎ অন্তর থেকে এভাবে মন্দ জানা এটা শরীয়তসিদ্ধ ঠিক আছে! অন্তর থেকে মন্দ জানার দ্বারা এটা উদ্দেশ্য নয় যে, আপনি মন্দও জানবেন, আবার একই মজলিসে তার সাথে উঠাবসাও করবেন, তার বাড়িতে দাওয়াতও খায়, তাকে নিজের দাওয়াতও খাওয়ায়, অন্তর থেকে মন্দ জানার উদ্দেশ্য হল, তোমরা তার সাথে উঠাবসা ছেড়ে দাও, তার সাথে খানাপিনা ছেড়ে দাও।

মোটকথা স্বীয় মুসলমান ভাইয়ের অনুপস্থিতিতে তাঁর প্রতিরক্ষা করা গীবত ও চোগলখুরির পথে প্রতিবন্ধক হতে পারবে। আর যদি আমরা নিজেদের জামাআতের

মাঝে, নিজেদের সমাজে এই দৃষ্টিভঙ্গির কার্যকর রুপ দেই, তাহলে ইনশা আল্লাহ কেউ চাইলেও এই গুনাহে লিপ্ত হতে পারবে না। আমাদের জামাআতবদ্ধভাবে, এবং সমাজবদ্ধভাবে এই গুনাহের বিরুদ্ধে আন্দোলিত/সোচ্চার হতে হবে। স্বীয় মুসলমান ভাইয়ের দোষ গোপন রেখে তাকে প্রতিরক্ষা করতে হবে। গীবতকারী মুখকে প্রতিহত করতে হবে। আর যদি প্রতিহত করতে না পারি, তাহলে অন্তত তার সাথে উঠাবসা বন্ধ করতে পারি, তার মজলিসে বসা খতম করতে হবে। আল্লাহ তাআলার কাছে দুয়া করি যেন, আল্লাহ আমাদের মুখকে এই সকল কাজ থেকে হেফাজত রাখেন, এবং এই মুখকে তাঁর সন্তুষ্টি অনুযায়ী চলার তাওফিক করুন। আমিন।

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين